

১৯৭১ এ রাজাকার কামরুজামান , শায়খ আবদুর রহমানের পিতা প্রমুখ
(শেরপুর-জামালপুর জেলা)

(মূল : মোঃ রহমতুল্লাহ, কোম্পানী কমান্ডার, ১১ নং সেক্টর ১৯৭১.)

শিশুকাল থেকেই ধর্মের প্রতি অনুরাগ ছিল আমার, প্রতিদিন সকালে কোরআন পড়াছিল নিয়মিত। যখনই শুনেছি বুজর্গ আলেম আসবে তখনই সেইস্থানে গিয়েছি তা যত দুরেই হউক। একবার নালিতাবাড়ীতে ওয়াজ মাহফিলের কথা শুনে দুপুরে না খেয়ে প্রায় ১২ মাইল পথ গিয়েছি বুজর্গানে দ্বীনের চেহারা মোবারক দেখার এবং ধর্মীয় ওয়াজ নসিহত শুনার জন্যে। তখন আমার বয়স বারো / তের বৎসর হবে। সেদিন রাতে ক্ষুধায় এবং শীতে যে কত কষ্ট পেয়েছি তা আজও মনে পড়ে। তবে মনকে সান্তনা দিতে পারি “বুজর্গী হুজুরের” সংস্পর্শে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া বেহেস্ত লাভ হবে।

আমার দৃষ্টিতে আমাদের স্কুলের আরবী শিক্ষক **ফজলুর রহমান** সাহেব খুব পরহেজগার আলেম ছিলেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল প্রকট। তিনি জামাতে ইসলামীর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তৎকালীন জাহানে নও পত্রিকা বগলে করে বিতরণ করতেন। তখন আমার রাজনৈতিক চেতনা ছিল না বা রাজনীতি বুঝার জ্ঞান হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই শ্রদ্ধেয় আরবী শিক্ষক **ফজলুর রহমান** জামাতে ইসলামীর শেরপুরের নায়েবে আমির হয়ে বর্তমান জামাতের সহকারী সেক্রেটারী আলবদর কামরুজামানকে দিয়ে অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছেন এবং শেরপুর পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে আওয়ামী লীগের নেতা সমর্থকদের হত্যার পরামর্শ দিয়ে লিখিত তালিকা পেশ করেছিলেন বলে শুনেছি। তিনি শেরপুরের অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং মানুষ হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত। শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি এবং ইসলাম প্রচারক আলেম হয়ে মানুষ হত্যা করায়; ভারত থেকেই তার প্রতি আমার চরম ঘৃণা জন্মিল। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হিসেবে তাকে ধরার জন্যে বহুচেষ্টা করেও ধরতে পারিনি। যদি আমার হাতে ধরা পরতো তবে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে তাকে আমি কি শাস্তি দিতাম তা হয়ত কল্পনাও করতে পারতো না। অথচ স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার তারমত ঘৃণিত এবং খুনি ব্যক্তিদেরও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলো। শেখ মুজিবের ঘোষণায় দেশের মানুষ হতবাক।

৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। জামালপুর মুক্ত করে কামাল খান মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আলবদর বাহিনীর প্রধান বহু মানুষ হত্যাকারী, ধনসম্পদ লুটকারী আব্দুল্লাহ ইবনে ফজলের বাড়ী ও মাদ্রাসা ঘেরাও করলাম। তিনি পলাতক। লুটের মাল উদ্ধার করে জামালপুরের এস ডি ও এর হেফাজতে দিলাম। আমাকে এস ডি ও সাহেব প্রশংসা করলেন এবং মাল্য দান করলেন। সরকারের সাধারণ ক্ষমার আওতায় খুনী আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল (ফজল মুগী) বর্তমানে বোমাবাজ কথিত শায়খ আবদুর রহমানের পিতার কোন শাস্তি পেতে হলো না।

১৯৬৬ সাল। তখন আমি ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্র। কলেজের ক্লাশ শেষে বড় মসজিদে নামাজ আদায় করতাম। ইমাম সাহেব মুসল্লীদের ইসলাম শাস্তি ধর্মের বয়ান করতেন। তার মুখের বয়ান শুনে আমি মুগ্ধ। যতদিন ময়মনসিংহ ছিলাম ততদিন জুম্মার নামাজ সেই ইমামের সহিত আদায় করে নেক্কার হয়েছিলাম বলে বিশ্বাস। বড় মসজিদের দু'তলা, তিন তলার উন্নয়নের কাজ শুরু হলে ইমাম সাহেব বলতেন “যে একটি ইট বা এক ঝুড়ি বালি এই মসজিদ নির্মাণের কাজে নিচ থেকে উপরে উঠাইবে সে আল্লাহর দয়ার উচ্চাশন বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে এবং বেহেস্তবাসী হবে।” আমি অনেকদিন অনেক মাস ইটা বালি দূর থেকে মাথায় করে মসজিদের দু'তলা, তিন তলায় উঠিয়েছি। মনে হতো ইমাম সাহেবের কথায় আমি বেহেস্তবাসী। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় ঐ ইমাম সাহেব নিজ হাতে স্বাধীনতার পক্ষের বহু লোককে হত্যা করেছেন বলে শুনেছি। তারপর ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে আমি যখন আমার বাহিনী নিয়ে ময়মনসিংহ পৌঁছলাম এবং তাকে খোঁজ করলাম সে তখন পলাতক। মানুষ হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারলাম না। মজিব সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষনার প্রেক্ষিতে সেই খুনী ইমামের কোন শাস্তি হলো না।

অনুলিখন: নূরুজ্জামান মানিক, ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক